Elearning Info
https://www.elearninginfo.in

পোস্ট অফিস থেকে মকবুলই হাতে ক'রে নিয়ে এল এনভেলপের চিঠিখানা। ছোট ডিঙি নৌকায় ক'রে চৌধুরী-বাড়িতে সে দুধের যোগান দিতে গিয়েছিল। সেই বাড়িতেই গাঁয়ের পোস্ট অফিস, আসবার সময় পোস্টমাস্টার তার হাতেই রাজমোহন রায়ের চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রশস্ত উঠোনে কোণাকুণিভাবে বাঁশের আড় টানানো। সেই আড়ে ঝি আর চাকরের সাহায্যে নিজের হাতে ভিজে পাট মেলে দিচ্ছিলেন রাজমোহন। চিঠির দশা দেখে আগুন হয়ে উঠলেন, 'হারামজাদা, এ করছিস কি!'

মকবুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'ক্যান্, কি হইছে ধলাকর্তা?'

রাজমোহন ফের ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কি হইছে! দ্যাখ, চাইয়া দ্যাখ দেখি চিঠিখানার দিকে। বলি, চিঠি কি খালের জলে চুবাইয়া আনছিস? দুধে জল মিশাইস বইলা চিঠিতেও জল মিশাইছিস? তোর সবতাতেই জল, হারামজাদা?'

মকবুল গম্ভীর মুখে বলল, 'অমন কথা কবেন না ধলাকর্তা, আমার দুধে পানি নাই। আমার নৌকায় তো পাটাতন নাই। এত কান্দাকাটি করলাম, একখানা তক্তা আপনে দিলেন না। গলুইর চারোটের কাছে রাখছিলাম চিঠি, জল লাইগা গেছে।'

রাজমোহন বললেন, 'জল লাইগা গেছে! এই বুঝি তোমার তক্তা আদায় করার ফন্দি। দ্যাখ মকবুল, তোর মত এমন কুচক্কুইরা মানুষ পাড়ায় আর দুইজন নাই। ওকি, যাইস ক্যান? বয় বয়। তামাক খাইয়া যা।'

উত্তর ঘরের বারান্দায় আগুন, মালসা, তামাকের ডিবে, মুসলমানদের জন্যে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে রাখা আলাদা হুঁকো-কলকে। মকবুল অপ্রসন্ন মুখে গিয়ে তামাক সাজতে বসল।

রাজমোহন পাট মেলা ক্ষান্ত রেখে এবার চিঠির দিকে তাকালেন। মাস কয়েক আগে চোখের ছানি কাটানো হয়েছে। চশমা ছাড়া লেখাপড়ার কাজ কিছু করতে পারেন না। চাকরকে ডেকে বললেন, 'এই কালু, আমার চশমাজোড়া আইনা দে তো। ওই দ্যাখ, জলচৌকির উপর চশমা আর পঞ্জিকাখানা রইছে। যা, নিয়া আয়।'

সাদা নিকেলের ফ্রেমে পুরু লেনস্। কাপড়ের খুঁটে কাঁচটা মুছে নিয়ে সাবধানে চশমাটা পরলেন রাজমোহন। তারপর প্রসন্ন মুখে চিঠিখানার দিকে চেয়ে বললেন, 'বউয়ের লেখা। ঠিকানাটাও অসীমাই লেখছে নিজের হাতে। বাবু সময় পায়ন নাই। তা বাবুর চাইয়া আমার বউর হাতের লেখাই ভালো, অনেক ভালো। কেডা কবে যে, মাইয়া-মাইনষের লেখা। ঠিক একেবারে পুরুষের ধরন, পুরুষের ছান্দ। টান-ঠানগুলি একেবারে পাকা। দেখছিস কালু, দেখছিস?'

তের-চৌদ্দ বছরের বালক চাকর কালু মণ্ডলের অক্ষর-পরিচয় হয়নি। তবু সে খামের উপর ইংরেজীতে লেখা ঠিকানাটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে তারিফ ক'রে বলল, 'তা ঠিকই কইছেন ধলাকর্তা, ঠাইরেনের হাতের লেখাটা খুব ভালোই। ঠাইরেন দেখতেও যেমন সোন্দর, তানার চাল-চলন, কওন-বলনও তেমনি। সেবারে যে আইছিলেন, আমারে দুইডা টাকা বকশিশ দিয়া গেলেন। নেব না, তবু জোর কইরা গছাইয়া দিলেন। আপনাদের কায়েতের ঘরের বউঝি ধলাকর্তা, রকমই আলাদা।'

বয়স অল্প হলে কি হবে, কালুর কথাবার্তা খুব পাকা। রাজমোহন একটু হেসে বললেন, 'আরে কেবল কায়েতের ঘরের মাইয়া হইলেই হয় না। ঘরখানা কেমন, বংশখানা কেমন, তা দেখবি না? চণ্ডীপুরের অম্বিকা বোসের নাতনী। এ অঞ্চলের মধ্যে অমন বিদ্বান বুদ্ধিমান গুণী মানী লোক আর ছিল না। তাঁর বাড়ির মাইয়া। আমি কি যেমন তেমন বউ ঘরে আনছিলাম?'

এবার এনভেলপের মুখখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা সশব্দে পড়তে লাগলেন রাজমোহন। পড়বার আগে কালুর দিকে চেয়ে বললেন, 'কেবল হাতের লেখা না, চিঠির মুসাবিদাটাও একবার শোন। তার মুসাবিদার কাছে উকিল-মহুরীও হাইরা যায়।'

মকবুলকেও ডাকলেন রাজমোহন, 'ও মকবুল, আয় এখানে, শোন আইসা।'

কৌতূহলী মকবুল হুঁকো হাতে উঠানে নেমে রাজমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল।

রাজমোহন পড়তে লাগলেন :

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, অনেকদিন হয় আপনার চিঠিপত্র পাইনে। আপনার চিঠি না পেলে আমরা বড়ই চিন্তায় থাকি। ওখানে আপনি একা একা আছেন। আমরা কেউ কাছে নেই, আপনার নাতি-নাতনীরা কেউ কাছে নেই, কেবল ঝি আর চাকর ভরসা ক'রে আপনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা একা কাটাচ্ছেন। একথা যখন ভাবি, আমার মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। আমরা থাকতে এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে না, একথা মনে হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকে না। কিন্তু কি করব ? আপনি তো আমাদের কথা শুনলেন না, অপনি তো পাকিস্তান ছেড়ে কিছুতেই এলেন না ! অথচ বিষয়সম্পত্তি সব বিক্রি ক'রে পাড়াপড়শীরা একে একে সবাই তো প্রায় চলে এসেছে। বাঁড়ুয্যেরা এসেছে, মুখুয্যেরা এসেছে, রাহারা এসেছে, সাহারা এসেছে। কুণ্ডুরা, নন্দীরা কেউ বাকি নেই। বলতে গেলে গ্রাম তো এখন একেবারে শূন্য। তবু আপনি এলেন না ! এলেন না, তা ছাড়া ভবিষ্যতের কথাও একবার ভেবে দেখলেন না ! অথচ যাঁরা আপনার বয়সী, যারা বৈষয়িক মানুষ, তাঁরা সবাই এতদিনে এখানে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। সময় থাকতে, দর থাকতে থাকতে ওখানকার স্থাবর-অস্থাবর সব বিক্রি ক'রে দিয়ে দু'পয়সা হাতেও করেছেন। কিন্তু আপনি কিছু করলেন না !

শুনতে পাই, আপনি নাকি লোকের কাছে বলে বেড়ান, বাড়ির সব জিনিস আপনার, সব সম্পত্তি আপনার, একগাছা কুটো, এক ছটাক জমিও আপনি নাকি বিক্রি করবেন না। মুসলমানেরা সব লুটে পুটে খাবে সেও স্বীকার, তবু আপনি কিছু ছাড়বেন না ! আপনার বাড়ি, আপনার ঘর, আপনার সম্পত্তি। আপনার যা ইচ্ছে, আপনি তাই করবেন। এর ওপর আমাদের কি বলবার আছে ? অধিকারই বা কি ?

কিন্তু আজ একটা অনুরোধ করবার জন্য আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। বেলেঘাটায় যে ঘর আমরা ভাড়ায় নিয়েছি, তা আপনি দেখে গেছেন। তার দেয়াল আর মেঝে থেকে যেন দিনরাত জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে। সেই স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে কানু, টেনু, রীণা, মীনা—আপনার অত আদরের নাতি-নাতনীদের কারো অসুখবিসুখই আর সারছে না। প্রত্যেক মাসে জ্বর-জ্বারি আর ডাক্তার-খরচ লেগেই আছে। আপনার ছেলের কাছে খাট-তক্তপোশের কথা বললে তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন, বলেন, টাকা কোথায় ? তা আমি বলি কি, আমার বিয়ের সময় আমার দাদুর দেওয়া আমাদের সেই পালঙ্কখানা আপনি এবার বিক্রি ক'রে দিন। দিয়ে সেই টাকা এখানে পাঠান। আমি খাট পারি, তক্তপোশ পারি, যা হোক একটা আপনার নাতি-নাতনীদের জন্যে কিনে নিই। ওদের কষ্ট আর দেখা যায় না।

ভেবে দেখুন, এতে আপনার আপত্তির কারণ নেই, অমতেরও কিছু নেই। এ তো আপনাদের বাড়ির জিনিস নয়। এক হিসেবে পরের জিনিস, পরের কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া। তা বিক্রি করলে আপনার সম্মানের কোনো হানি হবে না। আপনি আমার নাম ক'রেই বিক্রি করবেন। এখন পাটের সময়। মুসলমানদের হাতে টাকা-পয়সা আছে। এই বিক্রি করার সুযোগ। তাছাড়া ও পালঙ্ক রেখেই বা কি হবে ? কারো তো আর ভোগে আসবে না। মিছামিছি উঁইয়ে কেটে নষ্ট ক'রে দেবে। তার চেয়ে আপনি ওটা বিক্রি ক'রে দিন। টাকাটা কানু-টেনুর প্রয়োজনে লাগুক। আপনার ছেলেরও তাই মত।

এখানে শ্রীমান শ্রীমতীরা সকলে কুশলে আছে। অফিসের কাজকর্মের চাপে আপনার ছেলে একটুও সময় পান না। তিনি পরে সময় ক'রে চিঠি লিখবেন। পত্র-পাঠ আপনি পালঙ্কখানা বিক্রির

ব্যবস্থা করবেন। নিয়মিত চিঠি-পত্র লিখবেন। আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের অসীমা

সুরেন আলাদা চিঠি দেয়নি। স্ত্রীর চিঠির কোণায় এক লাইনে একটু সুপারিশ করেছে, 'আমার মনে হয় অসীমার প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।'

'না, আপত্তি কিসের ? কিছুতে আমার আপত্তি নাই, তোগো যা খুশি তাই কর, যা ইচ্ছা তাই কর।'

বলতে বলতে চিঠিটা সজোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাজমোহন। চড়া গলায় চাকরকে হুকুম করলেন, 'কাউলা, পুবের ঘর খুইলা পালংখানা বাইর কইরা আন দেখি। ও জিনিস আমি আর ঘরে রাখব না, ও পালং আমি আদাড়ে ফেলাইয়া দেব। তার বাপের বাড়ির সব জিনিস টোকাইয়া কুড়াইয়া তো নিয়াই গেছে। থাকবার মধ্যে আছে ওই পালং। ও জিনিস আর রাখব না। আরেক মেড়াকান্ত বউর গোলাম। তিনি আবার লেখছেন, আপনার আপত্তি থাকা উচিত নয়। না, আমার আর কোন আপত্তি নাই ! ও পালং আমার ঘর থিকা না সরাইয়া আমি অন্নজল মুখে দেব না। যা পালং খুইলা নিয়া আয়।'

কালু বাধা দিয়া বলল, 'ধলাকর্তা, শোনেন।'

রাজমোহন বললেন, 'না, আর শোনা-শুনি নাই, কাউলা। আমার যে কথা, সেই কাজ। ও পালং ভইরা আমি পেচ্ছাব করি, পেচ্ছাব করি। ও জিনিস আমার বাড়ি থিকা দূর কইরা না ফেলাইলে আমার মনের জ্বালা মেটবে না, কাউলা, আমার বুকের আগুন নেববে না।'

এগিয়ে গিয়ে রাজমোহন বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে পুবের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। এই ঘরে থাকত সুরেন আর তার স্ত্রী অসীমা। এক বছর আগেও সুরেন ছুটিতে এসে সপরিবারে এ ঘরে বাস ক'রে গেছে। পালঙ্কখানা দক্ষিণের দুটি বড় বড় জানালা ঘেঁষে এখনো পাতা রয়েছে। গদিটাকে পুরু চট দিয়ে ভালো ক'রে ঢেকে রেখেছেন রাজমোহন। রোজ একবার ক'রে এসে দেখেন, উঁই-ইঁদুরে কাটল কিনা। রোজ একবার ক'রে কাঁধের গামছা দিয়ে পালঙ্কের ধুলো মোছেন।.পুব দিকের বেড়ায় সুরেন আর অসীমার বাঁধানো ফটো। উত্তর দিকে ধানের গোলা আর স্তূপীকৃত শুকনো সাদা পাট।

রাজমোহনের পিছনে পিছনে মকবুলও এসে দোরের কাছে দাঁড়াল।

রাজমোহন বললেন, 'আয়, ঘরে আয় মকবুল, পালং খুইলা নিয়া যা।'

মকবুল বলল, 'এ পালং সত্যিই আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা ?'

রাজমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, নগদ টাকা পাইলে আইজই আমি এ জিনিস বিক্রি কইরা দেব। বিক্রি কইরা আইজই মনি-অর্ডার করব কইলকাতায়।'

মকবুল ঘরের ভিতরে ঢুকল। এ ঘরে খাওয়ার জল নেই, ঠাকুর-দেবতার আসন নেই, কামলা-কিষাণ—সবাই এঘরে আজকাল ঢোকে।

ঘরে এসে লুব্ধদৃষ্টিতে পালঙ্কখানার দিকে তাকাল মকবুল। ভারি শৌখীন দামী জিনিস। আগাগোড়া সেগুন কাঠের তৈরি। চারিদিকে চারটি পায়ায় বড় বড় বাঘের থাবা। হাত-খানেক চওড়া বাতায় ভারি সুন্দর নক্সার কাজ। উপরে লতা, নীচে লতা। মাঝখানে সুদীর্ঘ ছোট ছোট হাতীর সারি।

মকবুল আবার জিজ্ঞেস করল, 'পালংখানা আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা ? তা বউ-ঠাইরেন যে রকম খোটা দিয়া লেখছেন, তাতে আপনার মত মানী লোকের এ জিনিস রাখা উচিত না। তা এক কাজ করেন ধলাকর্তা, জিনিসটা আপনে আমারে দেয়ন গিয়া।'

রাজমোহন মকবুলের দিকে তাকালেন, 'তোরে ?'

মকবুল বলল, 'হ ধলাকর্তা। আমি মাগনা নেব না, সাইধ্য মত দাম দিয়া নেব। জিনিসটা তো আপনে আদাড়ে ফেলাইয়া দিতেই চাইছিলেন। তা আদাড়ে দেওয়াও যা, আমারে দেওয়াও তা। আমারে দিয়া দেয়ন জিনিসটা।'

রাজমোহনের আক্রোশ তখনও মেটে নি। মনে মনে ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়। মকবুলের ঘরেই এ জিনিস যাওয়া উচিত। যে রকমের মেয়ে তাঁর পুতের বউ, আর যে রকম ছোট তার প্রবৃত্তি, তাতে তার বাপের বাড়ির জিনিসের এই গতি হওয়াই ভালো।

মকবুলের দিকে তাকালেন রাজমোহন, 'পারবি ? নগদ টাকা দিয়া নিতে পারবি জিনিস ? আইজই এই মুহূর্তেই আমার ঘর পরিষ্কার কইরা দিতে পারবি ?'

মকবুল বলল, 'পারব ধলাকর্তা, আমি বাড়ি গুনা টাকা নিয়া আইলাম বুইলা। আপনি পালং খোলেন ততক্ষণ।'

মকবুল শেখের বাড়ি কাছেই। রাজমোহনদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে ছোট একটা জংলা পোড়ো ভিটে, তার দক্ষিণে সরু একটা খাল। অন্য সময় শুকনো খট্ খট্ করে, এখন বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। সেই খালের ওপারে মকবুলদের বাড়ি। জংলা ভিটায় একটা আমগাছের সঙ্গে আর মকবুলদের একটা তেঁতুলগাছের গোড়ায় বাঁধা বাঁশের সাঁকো। পায়ের নীচে এক বাঁশ আর ধরবার জন্যে উঁচু ক'রে বাঁধা আর একটা সরু বাঁশ। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে উৎসাহে প্রায় ছুটে গেল মকবুল।

তেঁতুলগাছের নীচে ছোট একখানা ঘর। ওপরে পুরনো করোগেট টিনের চাল। জায়গায় জায়গায় মরচে ধরেছে। বেড়াগুলির খানকয়েক বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি, সামনের খান-দুই পাঁকাটির। মাটির ভিত বর্ষার জলে থিক থিক করছে। মাটি খুঁড়ে গোটাকয়েক কেঁচো আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে ভিতরে। সামনে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ছোট একটু উঠান। খালের জল বাড়ির উপর উঠি উঠি করছে। এখনো ওঠেনি। উঠানে বসে একুশ বাইশ বছরের নীল রংয়ের একখানা জোলাকি শাড়িপরা ফর্সাপানা একটি বউ শাপলা কুটছিল। খানিক দূরে শাপলার ফুল নিয়ে খেলা করছে চার-পাঁচ বছরের উলঙ্গ রোগা রোগা দুটি ছেলেমেয়ে। কোমরে একটা ক'রে ফুটো পয়সার সঙ্গে একগাছি ক'রে কালো তাগা বাঁধা। দেহের আর কোথাও কিছু নেই। উঠানের পুবদিকে দিয়ে পাঁকাটি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। তাতে জ্বালানি হবে, ঘরের বেড়া হবে। সেই পাঁকাটির আড়ালে একটা রোগা হাড়-বের করা গরু খড় চিবুচ্ছে আর লেজ নাড়ছে।

রুদ্ধশ্বাসে মকবুল এসে স্ত্রীর সামনে দাঁড়াল, 'ফতি, ওঠ। উইঠ্যা শীগ্‌গির টাহা বাইর কর্।'

ফতেমা আঁচলখানা মাথায় তুলে দিয়ে কালো বড় বড় দুটি চোখ মেলে সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে তাকাল, 'এ তুমি কও কার নাগাল ? টাহা পামু কই ?'

মকবুল মুচকি হেসে বলল, 'পাবিআনে।'

তারপর নিজেই টাকার সন্ধান দিল। বাঁশের ছোট শুকনো চোঙাটার মধ্যে আছে ভাঁজ করা কয়েকখানা নোট। পাট বেচে, গাছ বেচে, গাইয়ের দুধ বেচে একটি একটি ক'রে সঞ্চয় করেছে সেই টাকা। স্ত্রীকে সেই টাকা বের ক'রে দিতে অনুরোধ করল মকবুল।

কিন্তু ফতেমা কিছুতেই উঠতে চায় না। কেবল ইতস্তত করে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে পরম অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বলল, 'সেই টাহা দিয়া না তুমি গাই কেনবা, সেই টাহা দিয়া না তুমি ঘর সারাবা, সেই টাহায় তুমি না আমারে গয়না গড়াইয়া দিবা কইছিলা। ও টাহা আমি দেব না, আমারে মাইরা ফেলাইলেও না।'

মকবুল হেসে বলল, 'আরে গয়নাই তো আনতেছি ঘরে। কেবল তোর গয়না না বউ, আমারও গয়না। দুইজনে মিলা একসঙ্গে পরব। কী চমৎকার পালং রে ফতি ! তুই তোর বাপের জনমেও দেখস নাই, আমিও না।'

সবিস্তারে মকবুল পালঙ্কের বর্ণনা দিল। ধলাকর্তা রাগ ক'রে পালঙ্কখানা সস্তায় বেচে দিচ্ছেন। এ সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না। বেশি দেরি করলে হয়ত ধলাকর্তার রাগ পড়ে আসবে। হয়ত অন্য কারো হাতে গিয়ে পড়বে জিনিসটা। মকবুলের আফসোসের আর সীমা থাকবে না। এর আগে হিন্দুরা কত খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাসন-বাটি বিক্রি ক'রে গেছে। জলের দামে মুন্সীরা কিনেছে, কাজীরা কিনেছে, সিকদাররা কিনে রেখেছে। মকবুল একটা জিনিসও ছুঁতে পারেনি। একটা পয়সাও তার হাতে ছিল না। এখন সুযোগ যখন হাতের কাছে এসেছে, এ সুযোগ

ছাড়া মোটেই সঙ্গত হবে না। একটা জিনিসের মত জিনিস অন্তত থাকুক মকবুলের ঘরে।

ফতেমা নরম হয়ে বলল, 'কিন্তু জিনিস যে রাখবা মেঞা, তোমার সে ঘর কই ? এই ভাঙা ঘরে রাজা-বাদশার পালঙ্ক মানাবে নাকি !'

মকবুল হেসে বলল, 'মানাবে ফতেমা, মানাবে। এই কুইড়া ঘরে আমার বেগমজান, আমার দিলজানরে মানাইতেছে না ?'

দুই আঙুল দিয়ে স্ত্রীর থুতনি উঁচু ক'রে ধরল মকবুল, 'আমার এই ভাঙা ঘর রাঙা হইয়া রইছে না তার রোশনাইতে ? এ ঘরে তোরে যদি মানায়, তাইলে পালংও মানাবে।'

ঘরের ভিতর গিয়ে বাঁশের চোঙাটা মেঝের ওপর উপুড় ক'রে ফেলল মকবুল। নোটে আর রেজগিতে মিলিয়ে বায়ান্ন টাকা সাড়ে দশ আনা। খুচরো টাকাটা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ফের সেই সাঁকোর উপর দিয়ে ছুটে চলল মকবুল। জংলা পোড়ো ভিটেয় পাড়ার ইয়াকুব চৌকিদার মাছ ধরবার দোয়াইর তৈরি করবার জন্যে বুনো লতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মকবুলকে ছুটতে ছুটতে যেতে দেখে বলল, 'অমন ঘোড়া দাবাড়াইয়া চললা কই মিঞা ?'

মকবুল বলল, 'আরে ভাই চকিদার নাকি ? আইস আইস, তোমারে দিয়া কাম আছে আমার। কথা আছে। তোমার দোয়াইর আমি বানাইয়া দেবনে, তুমি আইস।'

চৌকিদারের হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে চলল মকবুল।

রাজমোহন ততক্ষণে পালঙ্কখানা খুলে উঠানে নামিয়েছেন। মকবুল তাঁর পায়ের কাছে পঞ্চাশটি টাকা রেখে দিয়ে বলল, 'এই নেয়ন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'টাকা দিয়া কি হবে ? এ পালং তুই এমনিই নিয়া যা। নিয়া খালের জলে ভাসাইয়া দে গিয়া। এ জিনিস আমি আর ঘরে রাখব না।'

মকবুল বলল, 'এমনিই নিতাম ধলাকর্তা। আপনার কাছ থিকা চাইয়া নিতাম, কিন্তু এ তো আপনার জিনিস না, ঠাইরেনের বাপের বাড়ির জিনিস। টাহা আপনে ঠাইরেনরে পাঠাইয়া দেবেন।'

একটা বিষাক্ত তীর যেন বিঁধল গিয়ে রাজমোহনের বুকে। ঠিক ঠিক, এ পালঙ্ক তো তাঁর নয় ! এ তাঁর পুত্রবধূর বাপের বাড়ির জিনিস। এতে রাজমোহনের কোনো অধিকার নেই। সে কথা অসীমা তো স্পষ্টই লিখেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারা চিঠিখানা ভরে ওই একটি কথাই জানিয়েছে সে। দোয়াতের বিষ, তার অন্তরের বিষ কলমের ডগায় তুলে তুলে সারা চিঠি ভ'রে ছিটিয়ে দিয়েছে।

রাজমোহন চেঁচিয়ে বললেন, 'তাই দেব, তাই দেব। টাকার যখন এত খাঁই হারামজাদীর, টাকাই পাঠাইয়া দেব তারে। তুই এ জিনিস আমার চোখের সমুখ থিকা সরাইয়া নিয়া যা মকবুল, সরাইয়া নিয়া যা। ও তো পালং না, খাট না, ও আমার চিতার কাঠ। তুই সরাইয়া, নিয়া যা।'

ইয়াকুব চৌকিদারের সাহায্যে পালঙ্কখানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে পালাল মকবুল। এবার আর সাঁকোতে নয়, তার ভাঙা ডিঙি নৌকোয় পার ক'রে নিল।

ভারি ভারি পায়াগুলি ডাঙায় নামাতে নামাতে ইয়াকুব বলল, 'তুমি ভারি জিত জিতা গেলা মেঞা-ভাই। এ পালং-এর দাম দুইশ' টাকার এক পয়সাও কম হবে না, তোমারে আমি কইয়া দিলাম।'

কথাটা মকবুল এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'শালার বুইড়া কি আইচ্ছা বজ্জাত চকিদার ! মানুষ নয়, যখ। যখের ধনের মত সব আগলাইয়া রইছে। এত হিন্দু চইলা গেল, ও বুইড়ার যাওনের নাম নাই ! তা না গেছে না গেছে, ওয়ার জ্বালায় একটা ফল-পাকড়া ছোঁবার জো নাই, একটি জ্বালানি কুটা ছোঁয়ার জো নাই। অমনি ধাইয়া আসবে মারতে। আরে চউখ বোজলে খাব তো আমরাই, থাকব তো আমরাই। সুরেন ভুঁইঞা ফের আবার থাকতে আসবে নাকি ওই বাড়িতে ? ছাইড়া দ্যাও মোনে।'

ইয়াকুব বলল, 'তা ঠিক। পাকিস্তানে সে আর সাহস কইরা আসতে পারবে না। গেছে তো গেছেই।'

মকবুল বলল, 'বুইড়ার বাড়ি আমি খাস পাকিস্তান বানাব। আমার পোলাপান, আমার কবিলা ওয়ার ওই শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়া নইড়া চইড়া বেড়াবে। আমি জিতছি তুমি কইলা

মেঞাভাই, কিন্তু আমার তো মনে হয় আমি ঠইগা গেলাম। এ খাট আমি এমনিই পাইতাম, কাইড়া নিতাম বুইড়ার কাছ থিকা।'

তারপর একটু চিন্তা করে মকবুল বলল, 'না ভাই, ওডা কথার কথা, কাইড়া নেওয়ার চাইয়া দাম দিয়া নেওয়া অনেক ভালো। জিনিসটা নিজের হয়। কেউ কোন কথা কইতে পারে না। কি কও মেঞাভাই ? সাচা কইলাম, না মিছা কইলাম ?'

ইয়াকুব ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিকই কইছ।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খবরটা পাড়া ভ'রে ছড়িয়ে পড়ল, রাজমোহন তাঁর দামী পালঙ্কখানা জলের দামে বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। যে ধলাকর্তা ভিটের একটা বাঁশ বেচেন না, গাছ বেচেন না, একগাছা খড় বিক্রি করতে পর্যন্ত যাঁর সম্মানে বাধে, তিনি অমন শৌখীন সুন্দর একখানা পালঙ্ক কিনা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দিয়েছেন।

শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, গেদু মুন্সী, ছদন মৃধা—পড়া-পড়শীরা সবাই এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

শরৎ বলল, ধলাকর্তা, আপনার কি মতিচ্ছন্ন হইছে ! অমন জিনিসটা আপনি মোটে পঞ্চাশ টাকায় বেইচা ফেললেন ! আমারে দিলে আমি দেড়শ টাকা দিতাম।'

গেদু মুন্সী বলল, 'আরে থোও ফেলাইয়া তোমার দেড়শ। ও জিনিস আমি আড়াই শ' টাকা দিয়া নিতাম ধলাকর্তা। আমারে কইলেন না ক্যান্ ?'

রাজমোহন চটে উঠে বললেন, 'তোমরা যাও, চইল্যা যাও, আমারে বিরক্ত কইরো না। ও জিনিস আমি বিক্রি করি নাই, বিলাইয়া দিছি, ফেলাইয়া দিছি। তোমরা চইল্যা যাও।'

কিন্তু চলে যাওয়ার আগে ছদন মৃধা অনুনয় ক'রে গেল, 'আলমারি, চেয়ার, টেবিল, সিন্ধুক যদি কোন জিনিস ফের বিক্রি করেন ধলাকর্তা, আমারে কবেন, আমারে আগে জানাবেন। আমি নগদ টাকা দিয়া, ন্যায্য দাম দিয়া জিনিস নেব, ঠগাইয়া নেব না।'

ছদন মৃধার অবস্থা পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ভালো। পাটের কারবার ক'রে বেশ কিছু জমিয়েছে। মাঠেও প্রায় শ'খানেক বিঘা খামার। ছদন মুসলমানদের মধ্যে মানী গুণী লোক।

কিন্তু রাজমোহন তার পিছনে পিছনে প্রায় ধেয়ে গেলেন, 'তুমি চইল্যা যাও মেরধা, তুমি নামো আমার বাড়ি থিকা। আমি মইরা গেলে আইসা ভোগ দখল কইরো। কিন্তু যতক্ষণ বাইচা আছি, আমি আমার বাড়ির কিছু বিক্রি করব না। বেচিও নাই, বেচবও না।'

রাজমোহনের মূর্তি দেখে সবাই সামনে থেকে স'রে পালাল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ধলাকর্তার এবার ছিট হয়েছে মাথায়। হবে না ? ছেলে-বউ নাতি-নাতনীদের ছেড়ে একা একা এই শূন্য পুরীতে থাকে মানুষটি, তার মাথা খারাপ হবে না !

সকলে চলে যাওয়ার পর রাজমোহন কিছুক্ষণ নিজের মনেই গুম হয়ে রইলেন। ঠকেছেন, তিনি ঠকেছেন কোনো সন্দেহ নেই। ঝোঁকের মাথায়, জেদের বশে তিনি নিজের সর্বনাশ করেছেন। চোরের উপর রাগ ক'রে ভাত খেয়েছেন মাটিতে। মাটি খেয়েছেন।

খানিক্ষণ চুপ ক'রে চাকরকে ডেকে বললেন, 'কাউলা, নৌকা খোল। আমি কুমারপুর যাব।'

সোনাপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে কুমারপুর গঞ্জ। সেখানকার রেজেস্ট্রী অফিসে কাজ করেন রাজমোহন। দলিল লেখেন। আজকাল লিখতে ভারি কষ্ট হয়। হাত কাঁপে। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট, এমন কি অপাঠ্য হয়ে ওঠে। লোকে আর তাঁকে দিয়ে কাজ করাতে চায় না। কিন্তু কাজ তাঁর না করলে চলে না। কাজের জায়গায় তাঁর রোজ একবার ক'রে যাওয়া চাই। কাজের আশায় অফিস ঘরের বারান্দায় খানিকটা সময় কাটিয়ে আসা চাই।

সবাই বলে, 'আর ক্যান ধলাকর্তা ? এখন বয়স হইছে। এখন এসব ছাইড়া দেয়ন। এখন আর এত কষ্ট করেন ক্যান ?'

রাজমোহন জবাব দেন, 'না করলে ভাত হজম হয় না হরবিলাস। না কইরা দেখছি। হজম হয় না, ঘুম হয় না, অসোয়াস্তি লাগে।'

ছোট বৈঠাখানা নিয়ে নৌকায় যাওয়ার আগে কালু বলল, 'ধলাকর্তা, নাইয়া খাইয়া নিলেন না ?'

রাজমোহন জবাব দিলেন, 'না আইজ আর নাওয়া খাওয়া লাগবে না ! তুই তো পান্তা ভাত

খাইয়া নিছিস। তাইতেই হবে।' তারপর হঠাৎ আবেগরুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠলেন রাজমোহন, 'কাউলা, এ আমি করলাম কি, আমি হাতে কইরা মাটি খাইলাম, এ্যা কাউলা?'

'আমি তো আপনারে বারবার না করলাম ধলাকর্তা। আপনারে—' বলতে বলতে কালু থেমে গিয়ে বৃদ্ধ প্রভুর মুখের দিকে নির্বাক অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'চলেন, ধলাকর্তা।'

ধলাকর্তা। ধলাকর্তাই বটে, যৌবনে পাড়ার মধ্যে, গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সুপুরুষ ছিলেন রাজমোহন। দীর্ঘকায় চেহারা, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রঙ, উন্নত নাক, প্রশস্ত কপাল আর আয়ত চোখ। দেখলে রাজপুত্র ব'লে মনে হত। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে চেহারার সেই জৌলুষ আর নেই, দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কুঁচকে গেছে গায়ের চামড়া। রঙ নিষ্প্রভ হয়েছে। সুন্দর সুগঠিত দাঁতগুলির একটি কি দু'টি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আর একদিক থেকে রাজমোহন ধলাকর্তা হয়েছেন। এই কয়েক বছরে তাঁর মাথার চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। ভ্রূ সাদা হয়েছে, গোঁফ সাদা হয়েছে, বুকের ওপর একরাশ লোম বগী পাটের মত সাদা ধবধব করছে।

কালু চাকর বলল, 'ধলাকর্তা, নায় ওঠেন।'

'হ, উঠি।'

কাঁধে ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি, হাতে পুরনো ছেঁড়া চটি, বগলে তালি-দেওয়া ছাতা আর লাঠিখানা চেপে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠে বসলেন রাজমোহন, খাল ছেড়ে নৌকো কুমার নদীতে গিয়ে পড়ল।

রাত্রে ফিরে এসে হ্যারিকেন হাতে প্রথমেই পূবের ঘরখানায় ঢুকলেন রাজমোহন। ঘরের অর্ধেক খালি হয়ে গেছে! ঘরের দিকে আর চাওয়া যায় না! চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজমোহন। কিন্তু সেই খালি ঘর যেন পিছনে পিছনে ছুটে এলো। খালি ঘর যেন বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। বুক খালি ক'রে দিয়েছে।

উত্তরের ঘরে—নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন রাজমোহন। কাপড় ছাড়লেন, হাত মুখ ধুয়ে আহ্নিকে বসলেন। কিন্তু মন বসল না। পূবের ঘরের সেই খালি জায়গাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইষ্টমন্ত্রের বদলে পালঙ্কখানাকেই বারবার ক'রে মনে পড়তে লাগল।

হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেই নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে-যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনীর বিচ্ছেদ-দুঃখের কথা মনে পড়ল, কেউ যেন তাঁর থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্য পুরীতে, এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।

পরদিন সকালে উঠে তিনি প্রথমে কালুকে দিয়ে মকবুলকে ডেকে পাঠালেন। মকবুল এল না। কালুকে বলল, তার এখন মেলা কাজ। পরে সময় মত ধলাকর্তার সঙ্গে সে দেখা করবে।

রাজমোহন অবশিষ্ট দাঁতগুলি কিড়মিড় করলেন, 'হারামজাদার আস্পর্ধা দেখ! আমি ডাকলাম, বলে কিনা, কাজ আছে! কাজ আমি ওয়ার বাইর কইরা দেব।'

কালু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কি করবেন ধলাকর্তা? এখন ওয়াগো দিনকাল ওয়াগোই রাজত্ব। বড়া বাঁশের চাইয়া ছিটা কঞ্চির ত্যাজ বেশি।'

রাজমোহন বললেন, 'হুঁ।'

তারপর খানিক বাদে নিজেই চললেন মকবুলদের বাড়ির দিকে, ভালো ক'রে হাঁটতে পারেন না। বাতে বাঁ-পাটাকে প্রায় অকেজো ক'রে ফেলেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। জল-জঙ্গল ভেঙে সেই বাঁশের সাঁকো পার হয়ে রাজমোহন মকবুলের উঠানে এসে দাঁড়ালেন, 'কি করতেছিস মকবুল?'

দুধের যোগান দিয়ে এসে বারান্দায় বসে স্ত্রীকে নিয়ে গরুর দড়ি পাকাচ্ছিল মকবুল। রাজমোহনের গলার শব্দ শুনে ফতেমা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

মকবুল বলল, 'আসেন ধলাকর্তা, আসেন।'

কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে তেমন আন্তরিকতা ফুটে উঠল না। অবশ্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জলচৌকিখানা রাজমোহনকে ছেড়ে দিল মকবুল, বলল, 'বসেন ধলাকর্তা, তারপর কি মনে কইরা ? আমিই তো যাইতাম। আপনি কষ্ট কইরা আইলেন ক্যান আবার ?'

রাজমোহন বললেন, 'আইলাম তোগো দেখতে। কেমন আছিস খোঁজ নিতে। তা ঘরখানা তো ভালোই উঠাইছিস। ছাওয়ালপান নিয়া থাকবার মত বড়ও হইছে। তা পুরানো টিন দিছিস ক্যান চালে। বদলাইয়া নতুন টিন দে।'

কথার ফাঁকে একবার আড়চোখে মকবুলের ঘরের মধ্যে তাকালেন রাজমোহন। পালঙ্কখানা কালই পেতে ফেলেছে মকবুল। ওর সমস্ত ঘরখানাই প্রায় জুড়ে গেছে। উঁচু পালঙ্কের নিচে হাঁড়ি-পাতিল,ফতেমার গৃহস্থালি। উপরে গদি নেই, গদি মকবুলকে দেননি রাজমোহন। তার বদলে একটি মাদুর আর ছেঁড়া ময়লা কাঁথা বিছিয়েছে ফতেমা। একদিকে ওয়াড়হীন তেল-চিটচিটে গোটা দুই বালিশ। যেন চিতা থেকে কেউ তুলে নিয়ে এসেছে। তাঁর পালঙ্কের কি দশা করেছে এরা ! এ দৃশ্য দেখা যায় না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের কথায় ফিরে গেলেন রাজমোহন। বললেন, 'হ, টিন বদলাইয়া ফেলা, নইলে চাল নষ্ট হইয়া যাবে যে, জল পইড়া ঘর নষ্ট হইয়া যাবে।'

মকবুল বলল, 'বদলাব তো ধলাকর্তা কিন্তু টাকা কই ? মনে কতই তো সাধ—, একটা গাই কেনব, ভালো একখান নাও কেনব—কিন্তু টাকা কই ?'

রাজমোহন গলা নামিয়ে বললেন, 'টাকা তোর নিয়া আইছি।'

মকবুল চোখ তুলে তাকাল, 'কি কইলেন ?'

রাজমোহন বললেন, 'আয়, তোর সাথে কথা আছে আমার। বুঝাইয়া কই।'

চৌকি ছেড়ে উঠানে নেমে দাঁড়ালেন রাজমোহন।

কিন্তু মকবুল উঠতে চায় না। বলল, 'কয়ন কর্তা, যা ক'বার এখানেই কয়ন। নাই কেউ এখানে।'

রাজমোহন সেকথা শুনলেন না। ওর হাত ধ'রে প্রায় টানতে টানতে আড়ালে নিয়ে গেলেন।

চারদিকে জল, চারদিকে জঙ্গল, তিনদিকে খাল, একদিকে নদী। আশে পাশে দূরে দূরে আরো খানকয়েক মুসলমান-বাড়ি আছে। কোনটিতে জল উঠেছে। আর কোন বাড়ি জলের ওপরে জেগে রয়েছে। এক একটি বাড়ি যেন এক একটি দ্বীপ। পূব-দক্ষিণ কোণে ছোট একটা বাঁশের ঝাড়। সেখানে এসে দাঁড়ালেন রাজমোহন।

মকবুল বলল, 'ব্যাপার কি ধলাকর্তা ? কি কবেন, কইয়া ফেলেন।'

রাজমোহন ট্যাঁক থেকে মকবুলের দেওয়া কালকের সেই নোটগুলি বের করলেন। সেই সঙ্গে আর একখানা নতুন পাঁচ টাকার নোট। মকবুলের দিকে টাকাগুলি বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'গুইনা নে। মোট পঞ্চান্ন টাকা আছে। পাঁচ টাকা তোর ছাওয়াল-মাইয়ারে আমি মিষ্টি খাইতে দিলাম।'

রাজমোহনের বক্তব্যটা কি, তা মকবুল অনেক আগেই টের পেয়েছে। খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মকবুল। চোখ দুটো ভালো নয় মকবুলের। কেমন যেন লালচে লালচে। একটু পিছিয়ে গেলেন রাজমোহন। তিরিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ান পুরুষ—গায়ের রং ঘোর কালো। যেন আস্ত একটি গাব গাছ। মাথায় তাঁর চেয়ে লম্বা। খুব চওড়া নয়, কিন্তু শক্ত চোয়াড়ে-চোয়াড়ে হাত পা। মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। মুখে আবার শখ ক'রে চাপ-দাড়ি রেখেছে মকবুল। তাতে ঠিক একটা জন্তুর মত হয়েছে দেখতে।

রাজমোহনকে পিছিয়ে যেতে দেখে মকবুল একটু হাসল, 'ডরাইলেন নাকি ধলাকর্তা ! ডরাইবেন না। শত হইলেও আপনি বুড়া। এ মুল্লুকের মানী-জ্ঞানী মানুষ। আপনারে কি আমি অপমান করতে পারি ? কিন্তু ও টাকা আপনে ফিরাইয়া নিয়া যায়ন। আমার ছাওয়াল-মাইয়া মিষ্টি খায় না। খাইলে তাগো প্যাটে কিরমি হয়, প্যাট কামড়ায়, আপনে বাড়ি যায়ন ধলাকর্তা। খাট আমি ফেরত দেব না।'

অপমানে রাজমোহনের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো। রোমশ কান দুটো পুড়ে যেতে লাগল। টাকাগুলি ট্যাঁকে ফের গুঁজে রাখতে রাখতে রাজমোহন বললেন, 'আইচ্ছা, কিন্তু কথাটা মনে রাইখো

মকবুল শেখ, মনে রাইখো। পাকিস্তান পাইচ বইলা যে, সকলেই লাট হইয়া গেছ, তা ভাইবো না, ভাইবো না এক মাঘেই শীত যাবে।'

রাজমোহন চলে গেলে ফতেমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'হইছে কি ? ধলাকর্তা অমন রাগারাগি করলেন ক্যান্ ?'

মকবুল বলল, 'আর ক্যান্ ! খাট বিক্রি কইরা আবার সেই খাট ফিরাইয়া নিতি আইছেন। টাকা সাধাসাধি করতি আইছেন।'

ফতেমা বলল, 'কাণ্ড দ্যাখ। তা কি কইলা তুমি ?'

মকবুল হেসে বলল, 'পায়ে ধইরা কইলাম, ধলাকর্তা, যদি পছন্দ হয়, পালং-এর বদলে আমার বিবিরে নিয়ে যায়ন।'

ফতেমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আউ আউ আউ। বুড়া মানুষডারে তুমি অমন কথা কইতে পারলা ? শরম করল না ?'

মকবুল মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

ফতেমা এবার বুঝতে পারল, মকবুল তাকে ক্ষেপাবার জন্যেই এসব কথা বলছে। ধলাকর্তার সঙ্গে তার মোটেই এ ধরনের কথাবার্তা হয়নি।

ফতেমা এবার বলল, 'কিন্তু মাইয়া-মানুষই যদি সব মেঞা, মাইয়ামানুষ থাকলে যদি তোমাগো আর কিছুই না লাগে, তাইলে পালং পালং কইরা তুমিই বা অস্থির হইছ ক্যান্। দিয়া দাওনা ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে। উনি মানুষ তো সোজা না। ভালো না করতে পারেন, মন্দ করলে ঠ্যাকায় কেডা ? ছাওয়ালপান লইয়া ঘর করি, যাই কও, আমার কিন্তু বুকের মদ্যি কাপে।'

মকবুল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাপুক বিবি, কাপুক ! তোমাগো বুক কাপবার জন্যেই হইছে, কাপলেই সোন্দর ঠেকে।'

আঁচলটা বুঝি একটু সরে গিয়েছিল, ফতেমা তাড়াতাড়ি বুকের ওপর তাকে ভালো ক'রে টেনে দিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে লজ্জিতভাবে বলল, 'তোমার সাথে কথা কওয়ার জো নাই। আর ও দুইডা চউখ তো না যেন—'

উপমাটা হঠাৎ ফতেমার মুখে যোগাল না।

কিন্তু মকবুল ওর কথার ভাব বুঝতে পেরে হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের চউখ, জুয়ান মাইনষের চউখ ওই রকমই হয় বিবি। এতো আর ধলাকর্তার ছানিপড়া চউখ না, এ চউখের ধরনই আলাদা। দুনিয়ার অন্যায় অবিচার দেখলে রাঙ্গা হয়, আর দুনিয়ার সোন্দর জিনিস দেখলে এ চউখে রঙ ধরে।'

দিন দুই বাদে সন্ধ্যার পরে রাজমোহনের বাড়িতে ডাক পড়ল মকবুলের। উত্তর ঘরের চওড়া বারান্দায় পাশাপাশি দু'টি সতরঞ্চি পাতা। একটি মুসলমানদের জন্যে আর একটি হিন্দুদের। মাঝখানে তামাকের ডিবা, আগুন-মালসা, গুটিতিনেক ছোট বড় হুঁকো, দু'টি হিন্দুর একটি মুসলমানের।

পাড়ায় বর্ণহিন্দু বলতে আর কেউ নেই। যারা আছে, তারা সবাই কৃষ্ণবর্ণ। শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, ফটিক কর্মকার, নিবারণ রজক, এরা সকলেই রাজমোহনের অনুগৃহীত। অনেক সময় অনেক উপকার পেয়েছে। আর মুসলমানদের দলে আছে ছদন মৃধা, বদন সিকদার, গেদু মুন্সী।

মকবুল এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গেদু মুন্সী মুরুব্বির সুরে বলল, 'কাজটা তুমি ভালো কর নাই শেখের পো, দেশ ছাইড়া সব হিন্দু মশাইরা চইলা গেছেন। কিন্তু ধলাকর্তা আমাগো মায়া ছাড়েন নাই, তিনি আমাগো জড়াইয়া ধইরা আছেন। এখনো আমরা তানার জমি চষি, তানার বাড়িতে বসি, আপদে-বিপদে তানারে ডাকি। তুমি ধলাকর্তার জিনিস ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দাও গিয়া।'

মকবুল বলল, 'এমন অন্যায় কথা আমারে কবেন না, মুন্সী সাহেব। ধলাকর্তা নিজের হাতে তানার খাট আমারে ধইরা দিছেন, নিজের মুখে বিক্রি কইরা দিছেন। টাহা নিছেন আমার কাছ থিকা। ওই ইয়াকুব চকিদার তার সাক্ষী। এখন ওই খাট উনি আর ফেরত চায়ন কি বইলা ?'

রাজমোহন বড় একখানা জলচৌকিতে গম্ভীরভাবে বসে ছিলেন। ডানদিকে একটা হ্যারিকেন

জ্বলছে। তার ফিতেটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'টাকা নিছি ? ওই পালং-এর দাম পঞ্চাশ টাকা হয় ? তুই কইলেই হইল ?'

মকবুল বলল, 'আপনি তখন তাই কইছিলেন, ধলাকর্তা। তাছাড়া শক্তি বুইঝা জিনিসের দাম। পঞ্চাশের বেশি দেওয়ার আমার শক্তি নাই। আমি পঞ্চাশ দিয়াই নিছি।'

শরৎ শীল বলল, 'এ তো আর একটা কথার মত কথা হইল না মকবুল, তোমার শক্তি নাই, আর একজনের আছে। তুমি হয় আর একশ ধলাকর্তারে গুইনা দাও, নইলে পালং নিয়া আইস।'

হিন্দুরা ঘাড় নাড়লেও মুসলমানরা একথায় কোন উচ্চবাচ্য করল না। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরতে লাগল। কিন্তু সমস্যার কোন মীমাংসা হল না।

মকবুল স্পষ্টই বলল, 'এই যদি আপনাগো বিচার হয়, এ বিচার আমি মানতে পারব না। টাকা দিয়া জিনিস কিনা, জিনিস আমি ফেরত দেব না। আপনারা দেওয়ানী করেন, ফৌজদারী করেন, যা ইচ্ছা করেন গিয়া।'

গেদু মুন্সী ধমক দিয়ে বলল, 'যা যাঃ ! ছোট মুখে বড় কথা। বাড়ি গিয়া ভাইবা দেখ গিয়া, বিবির সাথে শলা-পরামর্শ কর গিয়া রাইত ভইরা। তারপর কাইল আইসা যা কবার কইস।'

মকবুল চলে গেলে গেদু মুন্সী আর ছদন মৃধা রাজমোহনকে প্রবোধ দেওয়ার সুরে বলল, 'আপনি ভাববেন না ধলাকর্তা ! ও অমন গোয়ার-গোবিন্দ মানুষ। পাড়ার কেডা ওয়ারে না চেনে ? ও কি কাউর কথার বাধ্য ? দেখি, বুঝাইয়া শুঝাইয়া। খাট নিয়া ও যাবে কোথায় ? আপনার খাট হজম করবে ওয়ার সাধ্য কি ? কিন্তু আপনেও রাগের মাথায় বড় কাঁচা-কাজ কইরা ফেলছেন ধলাকর্তা। আপনেও আর আমাগো কথা কওয়ার মুখ রাখেন নাই।'

মুন্সী আর মৃধার সঙ্গে আর সবাই একে একে বিদায় নিল। শরৎ বলল, 'সব মেওাই একজোট হইছে বোঝলেন ধলাকর্তা ! তলে তলে সকলেরই সায় আছে। নইলে মকবুল শেখের সাধ্য কি আপনার মুখের পর বলে যে, বিচার মানব না। চুপ কইরা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যায়ন, সইয়া যায়ন। যখন যেমুন তখন তেমুন। আপনার তো একখানা খাট। বাড়িঘর, জমিজোত কত জনে জলের দামে বিকাইয়া দিয়া গেছে না ? তাতে কি হইছে ? তাতে কি তারা মইরা গেছে ? মরে নাই। আপনে একখানা খাটের জন্যে আর মইরা যাবেন না, আপনি ইচ্ছা করলে এখনো অমন পাঁচখানা খাট কিনা ঘর বোঝাই করতে পারেন, তা আমরা জানি না ? য়ায়ন ঘরে যায়ন, রাইত হইয়া গেছে ঘরে যায়ন।'

আর এক ছিলিম তামাক টেনে শরৎ শীলও বিদায় নিল।

হ্যারিকেনটা বড় চোখে লাগছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে রাজমোহন অন্ধকারে চুপ ক'রে বসে রইলেন। পুবের ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে কালু এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা বাড়ি, সারা পাড়াটাই নিস্তব্ধ। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, বড় একা, একা রাজমোহন। সমস্ত অপমান তাঁকে একা একাই হজম করতে হবে। কোন উপায় নেই, কোন উপায় নেই। ভারি অসহায় বোধ করতে লাগলেন রাজমোহন। এই সময় যদি হারামজাদাটা বাড়ি আসত, যদি এসে তাঁর পাশে দাঁড়াত, তিনি কত বল পেতেন ! কিন্তু সে আসবে না। তাকে রাজমোহন আসতে লিখবেনও না। সে যেখানে আছে সেখানেই থাক, বউ ছেলে নিয়ে সুখে থাক।

বাপ-বেটায় কত মনোমালিন্য হয়, কত ঝগড়াবিবাদ হয়, তাঁদের মধ্যে তো তা হয়নি ! তবু সে দূরে স'রে গেছে। তার শিক্ষাদীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তির সঙ্গে রাজমোহনের মিল নেই। রাজমোহন যা ভালোবাসেন, সে তা বাসে না। যে জমি-জায়গা, ভিটে-মাটি, ধান-পাট, গাছ-পালা রাজমোহনের কাছে প্রাণের চেয়েও বড়, তার কাছে তা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। সে দেশ চিনল না, দেশের মানুষ চিনল না। চেনার মধ্যে চিনেছে শুধু চাকরি আর শুকনো একগাদা বই। চোখের পাতা বুজে মানুষের কথা, মানুষের মানে সে বইয়ের পাতায় খুঁজে বেড়ায়। না, তার সঙ্গে কোন মিল নেই রাজমোহনের। পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে স্থানান্তরী, দেশান্তরী হয়েছে। রাজমোহন আর সে এখন দুই ভিন্ন দেশকালের মানুষ।

জোলো হাওয়া দিচ্ছে। বাড়ির দক্ষিণ সীমান্তে দেবদারু গাছটার পাতা সেই হাওয়ায় অল্প অল্প

নড়ছে। কত বড় হয়েছে দেবদারু গাছটা ! রাজমোহন নিজের হাতে পুঁতেছিলেন এই গাছ। ঠিক সুরেনের বয়স গাছটার। সুরেনের মতই গাছটা রাজমোহনের চোখের সামনে বেড়েছে। কিন্তু তাঁর সমুখ থেকে সরে যায় নি।

'অনেক আপন, সে শত্তুরের চাইয়া, তুই আমার অনেক আপন দেবদারু। তোর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নাই। লেখাপড়া শিখা তুই পর হইয়া যাইস নাই। তুই আমার মতই ভিটামাটি আকড়াইয়া রইছিস। তোর মত আপন আমার কেউ না, সংসারে কেউ না।'

এই দেবদারু গাছটাকে কতজনে চেয়েছিল। একুশ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল গাছটার ! রাজমোহন দেননি। বলেছেন, 'আমি কিনি আমি বেচি না।'

জীবনে কিছুই বিক্রি করেননি রাজমোহন। শুধু একটা জিনিস ছাড়া। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রাজমোহনের। কেন করলেন—কেন বিক্রি করলেন পালঙ্কখানা ? হঠাৎ তাঁর এ কী মতিভ্রম হল ! জিনিসটা আর কি তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না ? এতজনের এত জায়গা-জমি তিনি উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন, আর ভুল ক'রে বিক্রি করা নিজের জিনিসটা তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না ! নিশ্চয়ই পারবেন। তাঁকে পারতেই হবে।

কিন্তু উদ্ধার করা সহজ হল না। মকবুলকে জব্দ করবার কোন ছিদ্র খুঁজে পেলেন না রাজমোহন। ও তাঁর ভিটে-বাড়ির প্রজা নয়, কোন টাকাকড়ি ধার নেয়নি। একটা মিথ্যা মামলামোকদ্দমায় ওকে জড়িয়ে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত মনে হল না। পাকিস্তানের আমলে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী মিলবে না। তাছাড়া মাতব্বর মুসলমানেরা ক্ষেপে উঠবে।

কিন্তু বড়রকম কোন শত্রুতা না করতে পারলেও মকবুলের ছোটখাট অনিষ্ট করতে ক্ষান্ত রইলেন না রাজমোহন। ওর কাছ থেকে আধসের ক'রে দুধ রোজ নিতেন, ছেড়ে দিয়ে ওয়াহেদের কাছ থেকে নিতে শুরু করলেন। কামলা-কিষাণ খাটাতে হলে, বাড়ির কাছে ব'লে সবচেয়ে আগে মকবুলকেই ডাকতেন, সেই ডাক বন্ধ হল।

মকবুল জাতচাষী নয়, কারো কোন বরগা জমি চাষ করে না। কিন্তু দরকার পড়লে জমিতে মজুরিগিরি করে। পাটের সময় পাট কাটে, পাট ধুয়ে মেলে দেয় ; ধানের সময়ও দলের সঙ্গে মিলে ধান কাটতে যায়। যখন শস্যের কোন কাজ থাকে না, ঘরামিগিরি করে, জ্বালানির জন্যে অন্যের বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করে, কাঠ চেলা ক'রে দেয়। এ সব কাজের জন্য রাজমোহনের বাড়িতে মকবুলেরই আগে ডাক পড়ত। কিন্তু এখন থেকে তিনি ওকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে, সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলতে লাগলেন। হিন্দুরা বেশির ভাগ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় মকবুলের কাজকর্ম এমনিতেই কমে গিয়েছিল। রাজমোহনের এই শত্রুতায় তা প্রায় বন্ধ হবার জো হল। মুসলমানপাড়ায় কামলা-কিষাণের চাহিদা কম। অবস্থাপন্ন ঘরের লোকও নিজের হাতেই প্রায় এসব কাজ সেরে নেয়। কাজের অভাবে মকবুল ভারি অসুবিধায় পড়ল।

কালুর কাছেই সব খোঁজখবর পেতে লাগলেন রাজমোহন। ডিঙি-নৌকায় তাঁকে কুমারপুরে পৌঁছে দিতে দিতে কালু বলল, 'ধলাকর্তা, আইচ্ছা জব্দ হইছে শেখের পো। হাতে না মাইরা ওয়ারে ভাতে মারবার জো করছেন আপনে। আপনার সাথে টেক্কা দিয়া ও পারবে ক্যান ? আপনার এক দাঁতের বুদ্ধি রাখে নাকি ও ?'

রাজমোহন তোবড়ানো গালে খুশি হয়ে হাসেন, 'তবু তো দাঁত আমার নাই কালু। সবগুলিই প্রায় পইড়া সারছে।'

কালু আশ্বাস দিয়ে বলে, 'যা আছে তাই যথেষ্ট ধলাকর্তা। আপনার খালি মাড়ির চোটেই ও অস্থির হইয়া ওঠবে।'

অস্থিরতা মকবুলের মধ্যে সত্যিই দেখা দেয়। স্ত্রীর কাছে কঠিন শপথ ক'রে বলে, 'দেখি আর দুই চাইরডা দিন। শালার বুইডারে আমি খুন করব। ওয়ার চউখের সামনে লুইটা পুইটা নেব।'

ফতেমা শঙ্কিত হয়ে বলে, 'খবরদার, খবরদার, অমন কামও কইরো না, অমন কথাও ভাইবো না মনে।'

মকবুল বলে, 'ক্যান ভাবব না ? জেল হবে, ফাঁসী হবে ? হউক, একজনের পেছনে না হয় আর একজন যাব।'

ফতেমা বলে, 'কিন্তু আমরা যে পইড়া থাকব। আমরা যাব কোথায় ? খবরদার, অমন কামও কইরো না। রক্ত অত গরম কইরো না। বোঝলা ? ছাওয়াল হইছে, মাইয়া হইছে, মাথা এখন ঠাণ্ডা কইরা চল। ওয়াগো খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাও। তয় তো বুঝি ক্ষমতা। তয় তো বুঝি তুমি পুরুষের মত পুরুষ।'

মকবুল বলে, 'হুঁ।'

ফতেমা বলে, 'হুঁ না। অমন লাফাইয়া-ঝাপাইয়া সর্দারি খেলাইতে তো সকলেই পারে। তার মধ্যে আর কেরামতি কি ? আসল কেরামতি পোলাপান মানুষ করায়, পোলাপান বাচাইয়া রাখায়, দেখছ ওয়াগো চেহারা ? শুগাইয়া শুগাইয়া কি দশা হইছে ওয়াগো, দেখছ ? আমার সোনার সবদুল আর মজনুর দিকে একবার চাইয়া দেখ।'

রোগা হাড়-বের-করা ছেলেমেয়ে দুটিকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নেয় ফতেমা। আস্তে আস্তে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ওদের খাদ্যের অভাব যেন শুধু স্নেহ দিয়েই মেটাবে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফতেমা আবার বলে, 'দ্যাখ, চাইয়া দ্যাখ!'

ছেলেমেয়েদের দিকে না চেয়ে স্ত্রীর মুখের দিকেই ক্রুদ্ধভাবে তাকায় মকবুল, রুক্ষ চড়া গলায় বলে, 'ক্ষ্যাপাইয়া দিস না ফতি, আমারে ক্ষ্যাপাইয়া দিস না। আমার মাথায় খুন চড়াইস না।'

ফতেমা স্বামীর হাত ধ'রে বলে, 'না, খুনাখুনির কাম নাই, আমার কথা শোন। ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দিয়া আইস। কি হবে খাট-পালং-এ। প্যাটে যদি দুইডা ভাত থাকে, চাটাই পাইতা শুইয়াও সুখ। তাতেও ঘুম আসে।'

স্ত্রীর মুঠো থেকে রাগ ক'রে হাত ছাড়িয়ে নেয় মকবুল, তারপর আরক্ত চোখে বলে, 'খবরদার ফতি, অমন কথা কবি না, মুখ গুতাইয়া ভাইঙ্গা ফেলব। আর বারবার ধলাকর্তার পালং—ধলাকর্তার পালং করিস না আমার সামনে। ও পালং আর ধলাকর্তার না, ও পালং আমার গাইটের টাহা দিয়া আনছি আমি। চুরি কইরা আনি নাই, ডাকাতি কইরা আনি নাই। নিজের রোজগারের টাহা দিয়া ঘরে আনছি পালং। এ জিনিস আমারই। বুঝলি ?'

এগিয়ে এসে পালংখানার একটা পায়া আঁকড়ে ধরল মকবুল। যেন ওর ঘর থেকে জিনিসটা কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু বাদে বালিকাচায় দা'খানা ধার দিয়ে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল মকবুল। কোথাও কাজ মিলল না। গরীব চাষী মুসলমানের গ্রাম। সকলের অবস্থাই প্রায় এই রকম। কে তাকে কাজ দেবে ? মকবুল আক্রোশে অধীর হয়ে বেড়াতে লাগল। ধলাকর্তাকে সত্যি সত্যি খুন করবার সাহস হল না, তাঁর বাড়িতে ডাকাতি করবারও সাহস হল না। শুধু দিনকয়েক ফাঁকে ফাঁকে চুরি ক'রে বেড়াতে লাগল। ঘর থেকে নয়, বাগান থেকে এককাঁদি পাকা সুপুরি চুরি করল, দুটো ডাব নারকেল চুরি করল।

রাজমোহন টের পেয়ে বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে খিস্তি ক'রে গালাগাল করলেন, থানা-পুলিসের ভয় দেখালেন, মুরারি মণ্ডলের ছেলে মুকুন্দকে কিছু পয়সা কবুল করে সারাদিনের জন্যে বাড়িতে পাহারার বন্দোবস্ত করলেন।

সুপুরি চিবিয়ে আর ডাব নারকেলের জল খেয়ে তো আর পেট ভরে না। মকবুল ভারি ফাঁপরে পড়ে গেল। বর্ষার এই সময়টাই সব বছরই কষ্টে কাটে। কাজকর্ম থাকে না, রোজগারপত্রও থাকে না। ধান চাল তেল ডালের দাম আক্রা হয়। কিন্তু এবার যেন কষ্টের মাত্রা সব চেয়ে বেশি। পাটের খন্দ শেষ হয়েছে। ধানের খন্দ এখনো আসেনি। এই সময় সকলেই বেকার। থৈ থৈ বর্ষা। সকলেরই ঘরে জল, বাড়িতে জল। হাঁড়িতে চাল নেই। সকলেরই কষ্ট। তার মধ্যে মকবুলের কষ্ট সবচেয়ে বেশি। দু'চার টাকা যা সঞ্চয় করেছিল, পালঙ্কের পিছনে গেছে। এখন হাত একেবারে খালি, পেট একেবারে খালি। পিঠের সঙ্গে তার দিনরাত মিতালি। ছেলেমেয়েগুলি দাপাদাপি করে, বউ-এর ঝগড়ার চোটে বাড়িতে টেঁকা যায় না। নিজের ছেলেমেয়েদের খাদ্য নিজেই যোগাড় করে

ফতেমা। দু' মুঠো ক্ষুদের সঙ্গে একরাশ শাপলা সিদ্ধ করে, কোনদিন বা একঝাঁকা কচু। আঁচল দিয়ে খালের ঘাট থেকে টাকির পোনা ধরে, চিংড়ি মাছ ধ'রে আনে।

এর মধ্যে ধলাকর্তার চাকর কালু এল একদিন খবর নিতে, 'কি মকবুল মেয়া, আজ কেমন ?'

মকবুল ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বেশ আছি। বড় মাইনষের বড় চাকর, তুই আছস কেমন ?'

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর কালু আসল কথা পাড়ল, 'পঞ্চাশের ওপর ধলাকর্তা আরো দশ টাকা তোমারে বেশি দিতে রাজী হইছে মকবুল। তানার পালং তানারে তুমি দিয়া দাও গিয়া, অবুঝ হইও না। বোঝলা ?'

মকবুল তেড়ে প্রায় মারতে এলো, 'আমি তো বুঝছিই, তোরে এবার জন্মের বুঝ বুঝাইয়া ছাড়ব। নাম্, নাম্ আমার বাড়িগুনা। ফের যদি অমন কুপেরস্তাব নিয়া আসবি, ঠ্যাং বাইড়াইয়া ভাঙব, কইয়া দিলাম তোরে।'

তাড়া খেয়ে কালু পালাল তো এলো ছদন মৃধা, এলো গেদু মুন্সী। আড়ালে ডেকে নিয়ে সকলেই একই কথা বলে। পালংখানা বিক্রি ক'রে দিক মকবুল। ধলাকর্তা জানতেও পারবে না, আর জানলেই বা কি ? পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছে তো মকবুল, ছদন মৃধা পঁয়ষট্টি দেবে। গেদু মুন্সী উঠল পঁচাত্তরে। কিন্তু মকবুল ঘাড় নাড়ল। পালং সে বিক্রি করার জন্যে কেনেনি, নিজে ব্যবহার করবার জন্যে এনেছে। পালঙ্কের দর দু'চার পাঁচ টাকা বেড়ে বেড়ে পুরো একশতে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু মকবুল কিছুতেই গোঁ ছাড়ল না। পালঙ্ক সে বেচবে না কাউকে। বউ-ছেলে নিয়ে নিজে শোবে, নিজে ব্যবহার করবে।

গেদু মুন্সী আর ছদন মৃধা দুজনেই দাঁত কিড়মিড় ক'রে মকবুলকে অভিশাপ দিয়ে গেল, 'মর শালা, না খাইয়া শুকাইয়া মর। যাওয়ার সময় গোরে নিয়া যাইস তোর খাট।'

ফতেমাও সেদিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আইচ্ছা, তুমি কি ! কেমুন ধারার মানুষ তুমি ! এ যদি এক বিঘা জমি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফসল দেবে। এ যদি একটা গাই হইত, বোঝতাম বছর বছর দুধ দেবে ; একটা গাছও যদি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফল দেবে। কিন্তু একখান শুকনো মরা কাঠ, তা তুমি ঘরে রাইখা মরতে চাও ক্যান ?'

মকবুল স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, কিন্তু রাগ না ক'রে আস্তে আস্তে স্নেহকোমল স্বরে বলল, 'রাখি যে ক্যান মাগী, তা তুই বুঝবি না। মাইয়া মানুষ হইয়া জন্মাইছিস, তা তোর বোঝবার কথা না। ও আমার কাছে মরা কাঠ নারে ফতি, ভারি তাজা জিনিস, ও আমার পুরুষের ত্যাজ !'

ফতেমা বলল, 'এতই যদি ত্যাজ, বাইর হও বাড়ির থিক্যা, চাকরি-বাকরি জোটাইয়া আন। শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমরা না খাইয়া মরব ক্যান ?'

মকবুল সে খোঁজ-খবরও নিয়ে দেখেছে, লেখা জানে না, পড়া জানে না—তাকে কে দেবে চাকরি ?

স্ত্রীর কথায় পরম দুঃখে, পরম নৈরাশ্যে মকবুল শুকনো ঠোঁটে একটুখানি হাসল, 'গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।'

দিন দুই বাদে গরুটা বিক্রি ক'রে ফেলল মকবুল। তিন-বিয়ানো গাই। আজকাল দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধই করেছিল। ঘাস-বিচালির অভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। একেবারে ভাগাড়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে মকবুল বেচে দিল ভিনগাঁয়ের লোকের কাছে। আর বেচল ছোট ভাঙা ডিঙিখানা। কিছু টাকা দিল ফতেমার হাতে, আর বাকি টাকায় একখানা ছই-ওয়ালা পুরনো নৌকো কিনল। কেরায়া বাইবে। সেই নৌকো নিয়ে ভোরে উঠে কুমারপুরে চলে যায় মকবুল। কোনদিন ভাড়া জোটে, কোনদিন জোটে না। আশায় আশায় ব'সে থাকে ঘাটে। বাড়ি ফেরে রাত দুপুরে। কোন দিন একটাকা পাঁচসিকে আনে। কোন দিন আসে শুধু হাতে। দেশের দিনকাল বড় খারাপ। দূরে দূরে কেরায়া যখন পায়, সবরাত্রে বাড়ি ফিরতে পারে না—ফেরে না মকবুল। ভিন্ন গাঁয়ের হাটে ঘাটে নৌকো বেঁধে ঘুমোয়।

নৌকো নিয়ে সেদিন বাইরে চলে গেছে মকবুল, ফতেমা পাঁকাটি দিয়ে উনুন জ্বেলে রান্না

চড়িয়েছে, রাজমোহন এসে উপস্থিত হলেন বাড়িতে, 'ও মকবুল, বাড়ি আছিস নাকি, ও মকবুল ?'

ফতেমা তাড়াতাড়ি বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল, ছেলেকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যা কর্তারে বল, সে বাড়ি নাই, নাও নিয়া বাইর হইয়া গেছে। কর্তারে পুছ কর, ওনার কি দরকার।'

কিন্তু পাঁচ বছর বয়স হ'লে কি হবে, মকবুলের ছেলে বড় হাবা। মা-বাবার সঙ্গে দু'একটা কথা যদি বা বলে, বাবুদের সঙ্গে মোটেই মুখ খুলতে পারে না। তাই আড়ালে থেকে ফতেমাকে কথাবার্তা চালাতে হল। রাজমোহন বললেন, 'কাসে বড় কষ্ট পাইতেছি। বাসকের পাতার রসে নাকি ভালো হয়। তোমাগো বাড়িতে বাসকের গাছ আছে। দুইডা পাতা নেব নাকি বউ ?'

ফতেমা হেসে বলল, 'নেবেন না ক্যান কর্তা ?—নেয়ন। দুইডা পাতাই তো, আপনি বারান্দায় বসেন, আমি আইনা দেই।'

'না না, আমিই নেব নে, আমিই নেব নে।'

ব'লে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে বসলেন রাজমোহন। ব'সে ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালেন। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক, তাঁর পালঙ্ক ! কিন্তু কি দশাই না ক'রে রেখেছে জিনিসটার ! অমন সুন্দর সুন্দর নক্সা-করা পায়াগুলিকে তেল মেখে চুন মুছে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। আর উপরে সেই তেল-চিটচিটে চিতার ছেঁড়া কাঁথা আর বালিশগুলি। ছি ছি ছি ! এত দামী জিনিস কি ওদের ঘরে মানায় ! এ সব জিনিসের যত্ন কি ওরা জানে !

একথা-সেকথার পর রাজমোহন আসল কথা পাড়েন, 'তোমারে একটা কথা বলি বউ, রাগ কইরো না। মকবুলেরে বুঝাইয়া শুঝাইয়া কও, পালংখানা ফিরাইয়া দিক আমারে। ও যে দাম চায়, সেই দামই আমি ওয়ারে দেব।'

বেড়ার আড়ালে ফতেমা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'না, ধলাকর্তা, ও কথা আমি তারে কইতে পারব না। আপনে বাসকপাতা নিতে আইছেন, পাতা নিয়া যায়ন। ও সব কথা কবেন না।' ব'লে ফতেমা সেখান থেকে সরে গেল।

গালে যেন একটা চড় খেলেন রাজমোহন। খানিক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন পালঙ্কখানার দিকে। বাসকপাতা আর নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না রাজমোহনের। তবু যাওয়ার সময় ছিঁড়ে নিলেন দুটো পাতা।

বারবাড়িতে পুজোর মণ্ডপ। তার মধ্যে রাধা-গোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, হাতে মুরলী, বামে চিরসঙ্গিনী রাধিকা। ব্রজমোহন রসরাজ শ্রীগোবিন্দ স্মিতমুখে চেয়ে রয়েছেন। স্নান ক'রে এসে সেই মণ্ডপের সামনে খানিকক্ষণ বসে রইলেন রাজমোহন। ধ্যানমন্ত্র জপ ক'রে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'দয়াল, আমার সব মায়ার বন্ধন কাটাও, আমারে তোমার বৃন্দাবনের পথে নিয়া চল। তোমার ব্রজের রাঙ্গা ধূলায় আমার কামনা-বাসনা, আমার লাঞ্ছনা-অপমান ঢাইকা যাউক।'

মনে হল, সবই বুঝি গেল। কিন্তু গেল কই ? পরদিন ফের রাজমোহনের বাসকপাতার দরকার পড়ল। চাকরের সামনে ইচ্ছা ক'রে জোরে জোরে কাসির অভিনয় করলেন। বাসকপাতা না হ'লে আর চলে না।

ধলাকর্তার সাড়া পেয়ে আজ কিন্তু ফতেমা আর ঝাঁপের আড়ালে এসে দাঁড়াল না, কথা বলল না। দূরে এক কোণে লুকিয়ে রইল। কি জানি, আজ যদি আবার ধলাকর্তা পালঙ্কের কথা পেড়ে বসেন। রাজমোহন সে কথা বুঝলেন। বাসকগাছ থেকে আজও দুটো পাতা ছিঁড়ে নিলেন। তারপর যাওয়ার সময় ফের এসে বসলেন বারান্দায়। আর কাউকে না পেয়ে মকবুলের ছেলে সবদুলের সঙ্গেই আলাপ করতে শুরু করলেন। চোখ দুটো নিজের শাসন মানল না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালঙ্কখানার দিকে তাকাতে লাগল। মকবুলের বাসকগাছ প্রায় নিষ্পত্র হবার জো হল। কিন্তু রাজমোহনের কাসি আর সারে না, আসা আর বন্ধ হয় না।

একদিন রাত্রে ফিরে এসে মকবুল স্ত্রীকে বলল, 'শুনি কি ? ধলাকর্তা নাকি রোজ আসা ধরছেন। আইসা এই বারান্দায় বইসা থাকেন ?'

ফতেমা বলল, 'হ, বাসকপাতা নেওয়ার জন্য আসেন।'

মকবুল হেসে বলল, 'দূর দূর। ঘোড়ার ডিম। তোরে দেখতে আসেন। তোর চান্দমুখ বুড়ার মনে ধরছে।'

ফতেমা রাগ ক'রে বলল, 'কি যে কও!'

মকবুল বলল, 'তাইলে আসল কথা কইয়া ফেল।'

ফতেমা বলল, 'কব আবার কি? আসল কথা তুমিও জান, আমিও জানি।'

মকবুল বলল, 'তা তো বোঝলাম। কিন্তু খবরদার, খবরদার। টাকা-পয়সার লোভে পাছে রাজী হইস, কথা দিয়া ফেলিস। তাইলে আর আস্ত রাখব না।'

ফতেমা বলল, 'ক্ষ্যাপছ? পালং-এর কথা ওঠাবে বইলাই তো আমি তার কাছ দিয়া ঘেঁষি না। কিন্তু বুইড়ার নজর বড় খারাপ। যতক্ষণ থাকে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাইয়া চাইয়া দেখে। আমার ভালো লাগে না। যাই কও, বুকের মধ্যে কাঁপে। পোলাপান নিয়া ঘর করি। কি হইতে কি হবে! মানুষের নজরে বিষ আছে।'

মকবুল হেসে বলল, 'দুর দূর। ওই ছানিপড়া চউখের নজরে কিছু হবে না। ও বিষ ধোড়া সাপের বিষ। তাতে মানুষ মরে না। তুই শান্ত হইয়া ঘুমা। আইচ্ছা, কাইলই আমি বুইড়ারে কইয়া দেব, আমার বাড়ি-মুকসুম যেন আর না হয়। হইলে পাও বাইড়াইয়া ভাঙব।'

কিন্তু মকবুলের নিষেধ করবার দরকার হল না! দিন দুই বাদেই রাজমোহন জ্বর আর রক্ত-আমাশয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন না। গাঁয়ের ডাক্তার এলো চিকিৎসা করতে, বলল, 'রায়মশাই, আপনার ছাওয়াল-বউরে একটা চিঠি দেয়ন। বুড়া বয়সে রোগটা তো ভালো না।'

রাজমোহন মাথা নেড়ে বললেন, 'না ডাক্তার, এখন না। খবর দেওয়ার সময় হইলে আমি তোমাকে কব। অফিসে নাকি তার প্রমোশনের কথা চলতেছে। এখন ছুটি নিলে সেডা আর হবে না। এখন যাউক।'

অসীমার নামে অন্য তহবিল থেকে টাকা নিয়ে পুরো দুশোই পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজমোহন। পঞ্চাশ টাকায় পালঙ্ক বিক্রি হওয়ার কথা কি আর বউ বিশ্বাস করবে? ভাববে, বাকি টাকা শ্বশুর ভেঙে খেয়েছেন। ডাক্তার রোজ যাতায়াত করতে লাগল। কিন্তু অসুখ বেড়েই চলল।

এদিকে মকবুলও বড় বিপদে পড়ে গেল। হাটের দিন রাত্রে নওপাড়ার ঘাটে মাদারগাছের সঙ্গে নৌকো শিকল দিয়ে আটকে রেখে উপরে হাট করতে নেমেছিল, এসে দেখে নৌকা নেই। তালা ভেঙে নৌকো চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। নওপাড়া চোরের জায়গা। গেদু মুন্সীর শ্বশুরবাড়িও ওইখানে। তার সঙ্গে বড় বড় চোরের সাট। বুঝতে কিছুই বাকী রইল না মকবুলের। আর এক জনের নৌকায় কোনরকমে বাড়ি ফিরল। পরদিন থেকে সেই আগের অবস্থা, আগের চেয়েও খারাপ। এখন আর গরু নেই, নৌকো নেই, কিচ্ছু নেই। এখন বিক্রি করার মত আছে শুধু একখানা ঘর আর ঘরজোড়া একখানা পালঙ্ক।

শুয়ে শুয়ে সব খবরই শুনলেন রাজমোহন। শরৎ শীল এসে বলল, 'হবে না! আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে গিয়েছিল, তার শাস্তি পাবে না ধলাকর্তা?'

দিন কয়েক বাদে কালু এসে সেদিন চুপে চুপে আর এক খবর দিল, 'ধলাকর্তা, শোনছেন নাকি?'

রাজমোহন আস্তে আস্তে বললেন, 'কি?'

কালু বলল, 'তালাকান্দার আতাজদ্দি শিকদারের কাছে নাকি মকবুল পালংখানা বিক্রি কইরা দেবে। আতাজদ্দি নতুন দালান উঠাইছে। সেই দালান সাজাবে পালং দিয়া।'

রাজমোহন নিস্পৃহভাবে বললেন, 'সাজাউক।'

কালু বলল, 'দেড়শ টাকা নাকি দর ওঠছে।'

রাজমোহন বললেন, 'উঠুক।'

কালু বলল, 'আইজ সন্ধ্যার পর আতাজদ্দি নাকি নিজেই নাও আর টাকার থইলা নিয়া আসবে।'

রাজমোহন পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, 'আসুক।'

সন্ধ্যার একটু আগে কালু ধলাকর্তার কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে গেল। পাশের গাঁয়ে মোল্লাদের বাড়িতে শখের থিয়েটার হবে। পালার নাম 'মীরকাশেম'। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক আসবে। আগে না গেলে কালু জায়গা পাবে না বসতে।

সন্ধ্যার পর বুবী ঝি পথ্যের বাটি রেখে গেল সামনে। রাজমোহন সে পথ্য মুখে তুললেন না। রাত বাড়তে লাগল, অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল, সমস্ত গ্রাম নিঝুম হয়ে এল। রাজমোহন কেবল এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। চোখে ঘুম আর আসে না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন রাজমোহন। দুর্বলতায় পা কাঁপছে। হাতড়ে হাতড়ে লাঠিগাছটা তুলে নিলেন। কোমরের তাগায় চাবি বাঁধা। সেই চাবি দিয়ে ঘরের তালা আটকালেন। বাইরে এসে দেখলেন আকাশে ঘন মেঘ। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ছাতা কি হ্যারিকেন নেওয়ার জন্যে ফের আর ঘরে গেলেন না রাজমোহন। লাঠিতে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন।

মিনিট পনের বাদে মকবুলের উঠানে দাঁড়িয়ে রাজমোহন ক্ষীণস্বরে হাঁক দিলেন, 'মকবুল, এই হারামজাদা, বাহির হ', ঘরের থিকা বাইর হ'।'

মকবুল ঘরের ঝাঁপ খুলে উঠানে এসে দাঁড়াল, 'কেডা ?—ধলাকর্তার গলা না ? ধলাকর্তা নাকি ?'

রাজমোহন দুর্বল জড়িত স্বরে বললেন, 'হ আমি। পালংখানা তুই বেইচা ছাড়লি হারামজাদা ? আমারে না জানাইয়া বেইচা ফেললি ?'

মকবুল অন্ধকারে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেডা কইল আপনারে ?'

রাজমোহন বললেন, 'আরে তা দিয়া তুই করবি কি ? এসব কথা কি গোপন থাকে ? মাছিতে গিয়া কয়।'

মকবুল বলল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে এই অন্ধকারে অসুখ নিয়া আপনি আসলেন ক্যামনে ধলাকর্তা ? পার হইলেন ক্যামনে ?'

রাজমোহন বললেন, 'চারের ওপর দিয়া পার হইছি।'

মকবুল বলল, 'সর্বনাশ ! আসেন, ঘরে আসেন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'আর তোর ঘরে যাইয়া করব কি ? তুই তো যা করবার করছিস।'

মকবুল বলল, 'না ধলাকর্তা, করি নাই। আসেন দ্যাখেন আইসা।'

হাত ধ'রে রাজমোহনকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল মকবুল। গায়ে জামা নেই, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। পায়ে জুতো নেই। পরনে নেংটির মত একখানা কানি। যে চশমা ছাড়া চলতে পারেন না, ভুলে সেই চশমাটাও ফেলে এসেছেন।

ঘরে গিয়ে মকবুল স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'ওঠ বউ, ওঠ। উইঠা বাতি জ্বালা। ধলাকর্তাকে দেখাই।'

পালঙ্কে প্রায় মূর্ছিতার মত পড়ে ছিল ফতেমা, স্বামীর ডাকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল, পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল।

তারপর কেরোসিনের ডিবাটা জ্বেলে উঁচু করে ধরল পালঙ্কের দিকে। বাঁ হাতে ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ফতেমা। কিন্তু ছেঁড়া ঘোমটায় মুখ ঢাকা পড়ল না।

পালঙ্কের এক ধারে দুইটি শিশু প্রায় মড়ার মত পড়ে আছে।

রাজমোহন বললেন, 'তাইলে বেচিস নাই ? আছে ?'

মকবুল বলল, 'আছে ধলাকর্তা।'

'আতাজদ্দি বুঝি আসে নাই ?'

মকবুল বলল, 'আইছিল। দেড়শর ওপর আরও দশ টাকা বেশি দিতে চাইছিল। তবু ফিরাইয়া দিছি। দুইদিন ধইরা উপাস ধলাকর্তা। তবু শালারে ফিরাইয়া দিতে পারছি। তবু শালার ক্ষিদার জ্বালারে ঠেকাইয়া রাখতে পারছি। বউটা কান্দাকাটি করতেছিল। কইলাম কি ধলাকর্তা, কইলাম—মাগী, আমারে আইজকার রাতখান সময় দে। অবুঝ প্যাটটারে জোর কইরা খামচাইয়া

ধইরা থাক। আইজকার মত, আমার মান বাচা, জান বাচা, রাখতে দে পালংখানা।'

রাজমোহন বললেন, 'মকবুল।'

মকবুল বলল, 'ধলাকর্তা।'

তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না। ফতেমা ঠিক তেমনি ক'রে কোরোসিনের ডিবাটা দু'জনের সামনে ধরে রইল। আর সেই ধোঁয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, ধলা আর কালো—দুই রঙের দুই পালঙ্কপ্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

একটু বাদে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মকবুল বলল, 'ফতি, পোলাপান দুইডারে নিচে নামাইয়া শোয়া। আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।'

রাজমোহন বললেন, 'সে কি কথা, মকবুল!'

মকবুল বললেন, 'হ ধলাকর্তা, আপনে নিয়া যায়ন পালং। আইজ আমি রাখলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি?'

ব'লে মকবুল সত্যিই ছেলেমেয়ে দুইটিকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, রাজমোহন বাধা দিয়ে ওর হাত ধরলেন, বললেন, 'খবরদার!'

তারপর আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'এতদিন চুরি কইরা কইরা তোর ঘরের পালং আমি দেইখা গেছি মকবুল। কিন্তু খালি পালং-ই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম—দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে। আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আয় মকবুল।'

স্ত্রীর হাত থেকে কেরোসিনের ডিবাটা তুলে নিতে নিতে মকবুল বলল, 'চলেন ধলাকর্তা।'

শ্রাবণ ১৩৫৯

প্রতিভূ

বিয়ের পর দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে ইজিচেয়ারে আয়েস করে শুয়ে স্ত্রীর ছবির এ্যালবামটা উলটে পালটে দেখছিল শুভেন্দু। হাতে কোন কাজ ছিল না, ঘরে কোন লোক ছিল না। শুধু তারা দুজনে। শুধু সে আর সেবা, শ্বশুরমশাই এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। সন্ধ্যার আগে ফিরবেনও না। শাশুড়ী রান্নাঘরে জলখাবার তৈরিতে ব্যস্ত। ন'দশ বছরের শালী রেবা ফুট-ফরমায়েস খাটছে। কখনো পান জোগাচ্ছে, কখনো সিগারেট, কখনও চা। শুভেন্দু এক মুহূর্তও তাকে ঘরে থাকতে দিচ্ছে না। সে ঘরে থাকলে সেবাকে মাঝে মাঝে ছোঁয়া যায় না, যখন তখন যা তা কথা বলা যায় না; ওর নরম সুন্দর তুলতুলে হাতখানাকে তুলে নেওয়া যায় না নিজের হাতে। রেবা ঘরে থাকলে অনেক অসুবিধে।

স্বামীর চালাকি বুঝতে পেরে সেবা একটু হেসে বলল, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর, রেবার ওপর তোমার মোটেই দয়ামায়া নেই।'

শুভেন্দু বলল, 'আরও পাঁচ ছয় বছর পরে যখন ওর সম্বন্ধেও আমার দয়ামায়া জন্মাবে, হৃদয় আরও উদার হবে তখন হে হৃদয়েশ্বরী, তোমার নির্দয়তার সীমা থাকবে না।'

সেবা এবার বলল, 'তুমি বড় দুষ্টু।'